একক ১ ❑ ১৯৪৭ সালে ভারত

গঠন ঃ

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ ১৯৪৭ সালের ভারত, দেশভাগের অভিঘাত ও পরিণাম

১.২ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের দৃষ্টান্ত

১.৩ বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভারতের সংহতি

১.৪ নতুন সংবিধান ও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত বুনিয়াদ

১.৫ গণতন্ত্রের ভিত্তি ঃ ধর্মনিরপে(তা, জনকল্যাণ ও মৌলিক অধিকার

১.০ প্রস্তাবনা

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম পর্বের ইতিহাস বর্তমান পর্যায়ের আলোচ্য। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করে। ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি(র প্র্ন তখনও ছিল অমীমাংসিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ক্র(মশ জোরালো হয়। ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত গড়েন প্রধানমন্ত্রী নেহে(। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল এবং বিরোধী রাজনীতির প্রসঙ্গ দ্বিতীয় এককে আলোচিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে এদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসাবে বি(্বাসীর চোখে স্বীকৃতি লাভ করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তিত হয়। সামাজিক ন্যায়াধিকার প্রতিষ্ঠা নেহে(র ল(্য ছিল।

নেহে(র প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ভারতের বিদেশনীতির মূল রূপরেখা নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। নেহে(র নেতৃত্বে ভারত নির্জোট আন্দোলনের ডাক দেয়। প্রধানমন্ত্রী বি(্বশান্তির প্রবক্তা হলেও .... সঙ্গে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়নি।

১.১ ১৯৪৭ সালের ভারত

দেশভাগের অভিঘাত ও পরিণাম ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। ঔপনিবেশিক শক্তি(র বি(দ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। সাম্রাজ্যবাদের বি(দ্ধে এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে যে সংগ্রাম তখনও চলছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভের দৃষ্টান্ত তা উদ্বুদ্ধ হয়। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের বাস ভারতবর্ষে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে তাদের মুক্তি(লাভ ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৪৭

সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে(বলেন— নিয়তির সঙ্গে অভিসারে বহু অংশে আমরা বেরিয়েছিলাম। সেই প্রতিশুতি যদি বা সম্পূর্ণ র(া করা সম্ভব না হয়, তবু অনেকাংশে র(া করার সময় এখন এসেছে। পৃথিবী যখন নিদ্রিত, স্বাধীনতা ও নবজীবনের স্পন্দনে ভারত তখন জাগ্রত। (''Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not loholly a full measure, but very Substantially.

নেহে(র এই উক্তি(তে কোটি কোটি ভারতবাসীর আশা- আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। বাস্তবে পরিস্থিতি কিন্তু এমন ছিল যাতে ব্রিটেনকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারত ত্যাগ করতে হয়। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। যুদ্ধের ভয়ংকর (য়-(তির পর দেশ পুনর্গঠন ছিল ব্রিটেনবাসীর সামনে প্রধান সমস্যা। সাম্রাজ্যের বোঝা অতিরিক্ত(ভার হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের শ্রমিক দল নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভারতে সাম্রাজ্য আর্থিকভাবে লাভজনক ছিল না। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে জানা যায়, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতির(ার ব্যয় মেটাতে রাষ্ট্রের মোট ব্যয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ নিয়োজিত হয়। যুদ্ধের বছরগুলিতে ব্রিটেনকে পণ্য সরবরাহের বিনিময়ে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড ভারতের প্রাপ্য হয়। অর্থনীতিবিদ কেইলস দেখিয়েছেন, এ সময়ে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৪০০ মিলিয়ন পাউন্ড। ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্-বের পর ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব চরম আকার ধারণ করেছিল। যুদ্ধোত্তর কালে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈন্যদের বিচার, নৌ-বিদ্রোহ এবং তেভাগা ও তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সাধারণের (োভ বারবার প্রকাশ পাচ্ছিল। বড়লাট ওয়াভেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন ভারত আগ্নেয়গিরির উৎসমুখের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশ ত্যাগ করা ব্রিটিশদের কাছে সমীচীন মনে হয়। আন্তর্জাতিক (েত্রেও ভারতের স্বাধীনতা প(ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি(মত দেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আটলান্টিক সনদে অঙ্গীকার করা হয়েছিল ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারবে না এবং পরাধীন জাতিগুলি নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার দাবি ত্র(মশ তীব্র হতে থাকে। সবসুদ্ধ অনন্যোপায় হয় ব্রিটেন সাম্রাজ্য থেকে নি°(মণের পথ খুঁজতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক আর. জে. মুর এই পর্বের ইতিহাসকে তাই ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলেছেন Escape from Empire.

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে (মতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ব্রিটেন ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ক্যাম্বেল জনসন, হডসন, পেন্ড্রেল মুল, জুডিথ ব্রাউন প্রমুখ ব্রিটিশ লেখক এবং ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাকে '(মতা হস্তান্তর' (Transfer of Power) বলেছেন। বিভিন্ন সময়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয়দের ত্র(মশ প্রহসনের সঙ্গে যুক্ত(করার যে প্রক্রি(য়া আগেই শু(হয়েছিল, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনাকে তার চূড়ান্ত পরিণতি বলে তারা মনে করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই ঘটনাকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ বলে, প্রথমে মেনে নিতে চায়নি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী (মতা গ্রহণ করেছে এই ধারণায় তাদের প্রচার ছিল ''ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়''। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইংরেজ শক্তি(র বি(দ্ধে ''অবস্থানগত লড়াই'' বলে অধ্যাপক বিপান চন্দ্র বর্ণনা করেছেন। এই লড়াইয়ের বিভিন্ন পর্যায় ছিল। প্রতিটি পর্যায় থেকে সরকারের কাছ শেষে ভারতীয়রা কতকগুলি সুবিধা আদায় করতে স(ম হয়। শেষ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে তারা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে।

১.২ দেশভাগ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অভিজ্ঞতার তুলনা

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় থেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মনে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষণার পর তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। একদিকে পশ্চিম ও পূর্ব পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্ব ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে শরণার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে প্রায় পাঁচ ল(শরণার্থী পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লী, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক কর্তৃক ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত ইউ. ভাস্কর রাওয়ের লেখা The story of Rehabilitation গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়। আগস্ট মাস শেষ হওয়ার আগে মুসলমান ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ লাহোর ছেড়ে চলে যায়। অন্যদিকে, প্রায় সত্তর হাজার মানুষ অমৃতসর থেকে লাহোরে প্রবেশ করে। (তথ্যসূত্র ইউ. ভাস্কর রাও) বিপরীতমুখী শরণার্থীদের মধ্যে পথে সংঘর্ষ এবং সম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটতে থাকে। বাসে ট্রেনে পায়ে হেঁটে ল(ল(মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। ইউ. ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, পশ্চিম পাকিস্তানে এই সময়ে প্রায় চার ল(হিন্দু নর-নারীর খোঁজ মেলেনি।

পূর্ব ভারতের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। ভাস্কর রাও প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিমে আশ্রয় গ্রহণকারী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৯,০০০। দেশভাগের সময় বাংলার কতকগুলি অঞ্চলে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। চট্টোগ্রামের পাজরা অঞ্চলে হিন্দুরা ছিল মোট জনসংখ্যার ৯০ ভাগ। মোট হিন্দু অধিবাসীদের শতকরা ৪২ ভাগ ছিল পূর্ববঙ্গে। পরবর্তী এক দলকে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সংখ্যাগত হিসাব ভাস্কর রাও দিয়েছেন, বছর অনুযায়ী বিন্যাস করলে যা দাঁড়ায় এরকম ঃ—

সাল	শরণার্থী সংখ্যা
১৯৪৭	৩.৫ ল(
১৯৪৮	প্রায় ৮ ল(
১৯৪৯	২১৩,০০০
১৯৫০	১,৫৭৫,০০০
১৯৫১	১৮৭,০০০
১৯৫২	২০০,০০০
১৯৫৩	৭৬,০০০
১৯৫৪	১.১৮ ল(
১৯৫৫	২.৪৩ ল(
১৯৫৬	৩.২০ ল(

১.৩ বল্লভভাই প্যাটেল এবং ভারতের সংহতি

স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬-এর ১৩ই খেতাধিয়ের প্রস্তাবে উল্লেখ করে যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে দেশীয় রাজন্যবর্গ শাসিত রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ রাজ্যের

সার্বভৌমিত্বের অবসান ঘটবে। মন্ত্রী মিশন সুপারিশ করে যে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন... গঠন করা হবে এবং পররাষ্ট্র নীতি দেশর(া প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ইউনিয়ন সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের (মতা দেশীয় রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত(থাকবে। দেশীয় রাজন্যবর্গ মন্ত্রী মিশনের সুপারিশগুলো সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রস্তাবিত ভারত ইউনিয়নে যোগদান আবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার রাজন্যবর্গের থাকবে। (২) ভারত সরকারের হাতে সমর্পিত (মতাগুলি রাজন্যবর্গ ফিরে পাবেন। (৩) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের শাসনযন্ত্র ভৌমিক অখণ্ডতা এবং রাজবংশের উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত আইনকানুন অব্যাহত থাকবে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা দেশীয় রাজ্যগুলির ওপর ব্রিটিশ সার্বভৌমিকত্বের অবসান ঘোষণা করা হয় এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত ইউনিয়ন অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগদান করার জন্য অথবা ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়। ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হলে কয়েকটি বৃহৎ দেশীয় রাজ্য যথা ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় কংগ্রেস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে ভারত উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত(কোন রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে কোন দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তা স্বাধীন ভারতের বি(দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমপর্যায় তুল্য বলে গণ্য করা হবে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাবে 'দেশীয় রাজ্য দপ্তর' নামে একটি নতুন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। সর্দার প্যাটেল এই দপ্তরের দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করেন এবং ভারত ইউনিয়ন ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে অগ্রসর হন। ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ ২৩শে জুলাই দেশীয় রাজন্যবর্গের এক সম্মেলনে বক্তৃ(তাদান কালে একই মর্মে আবেদন জানান। সর্দার প্যাটেল ও মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শত্র(মে জুনাগড় হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া সকল দেশীয় রাজ্যগুলি কতকগুলি শর্ত সম্বলিত একটা চুক্তি(পত্র স্বা(র করে ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে। ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যাপারে দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রথম উপায়টি হল কেন্দ্রীয় সরকার — শাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এদের সংযুক্তি(করণ অথবা সন্নিকটস্থ প্রদেশগুলির সঙ্গে সংযুক্তি(করণ— যেমন উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে পূর্বতলের রাজ্যগুলির সংযুক্তি(এবং বোম্বাইয়ের সঙ্গে দা(িণাত্য ও গুজরাটের রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি(, দ্বিতীয় পন্থাটি হল কয়েটি রাজ্যকে সংযুক্ত(করে একটি বৃহৎ যুক্ত(রাজ্য গঠন করা, যেমন রাজস্থানের যুক্ত(রাজ্য পাঞ্জাবের যুক্ত(রাজ্য প্রভৃতি। দেশীয় রাজন্যবর্গ ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তি(স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ শাসনাধিকার ত্যাগ করেন।

ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য ছিল হায়দ্রাবাদ। এই রাজ্যের শাসনকর্তা নিজাম ছিলেন মুসলমান। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রজাই ছিল হিন্দু। ভারত বিভাগ হবার পূর্বেকার অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদ ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি(' সম্পাদন করে। শীঘ্রই নিজাম এক উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ভারত বিরোধী সংস্থার নেতা কাশিম রোজভির প্রভাবাধীন হয়ে পড়লে পরিস্থিতি বিশেষ জটিল হয়ে ওঠে। বেজভি হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা র(া করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এমনকি নিজাম ভারতের বি(দ্ধে ইউনাইটেড নেশনস এ অভিযোগ পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার হায়দ্রাবাদের বি(দ্ধে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হায়দ্রাবাদ ১৯৫০ সালের ২৩শে জানুয়ারী ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে।

হায়দ্রাবাদ সমস্যা যখন সমাধান হয়েছে তখনই জম্মু কাশ্মীর রাজ্যকে নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই

রাজ্যের শাসক ছিলেন হিন্দু। কিন্তু প্রজাদের গরিষ্ট সংখ্যা ছিল মুসলিম। ভৌগোলিক অবস্থান এবং মুসলমান 'সংখ্যা গরিষ্ঠতা' হেতু পাকিস্তান এই রাজ্যটিকে অধিকার করতে অগ্রসর হয়। পাকিস্তান সরকারের প্রত্য(সহায়তায় উপজাতীয় আত্র(মণকারীরা জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে লুঠতরাজ শু(করে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়লে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেও ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তি(র চুক্তি(তে এই রাজ্যের শাসক মহারাজা হরি সিং স্বা(র করেন। নিখিল জম্মু-কাশ্মীর কনফারেন্স-এর সভাপতি শেখ আবদুল্লা ভারতভুক্তি(র ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। হানাদারদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে আজাদ কাশ্মীর সরকার গঠিত হয়। পাকিস্তান সরকার আজাদ কাশ্মীর সরকারকে সর্বতোভাবে সামরিক সাহায্য পাঠাতে থাকে। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরের অন্যত্র এক জ(রী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনাইটেড নেশনস-এর কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করে। ইউনাইটেড নেশনস আজও কাশ্মীর সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেনি। বর্তমানে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ঘোষিত হয়েছে এবং কাশ্মীরের পাকিস্তান 'অধিকৃত অঞ্চল' আজাদ কাশ্মীর এই নামে পাকিস্তানের অধিকারই থেকে গেছে।

১.৪ নতুন সংবিধান এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শগত বুনিয়াদ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ বছরের জুলাই-আগষ্ট মাসে প্রাদেশিক আইনসভার প্রতিনিধিবৃন্দ গণ পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন। জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের প্রাধান্যের প্রতিফলন গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচনেও দেখা যায়। নেহে(, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পন্থ, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা গণ পরিষদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা পরিষদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।

তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা ভীমরাও আম্বেদকর পরিষদ-নিযুক্ত(সংবিধান খসড়া রচনা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত(হন। কমিটির অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন হিন্দ মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ আল্লাদি কৃষ(স্বামী আয়েঙ্গার, নির্দল সদস্য কে. এম. মুন্সী প্রমুখ। সংবিধান রচনা সভায় বরোদা রাজ্য অংশগ্রহণে করেছিল রাজ্যের তৎকালীন দেওয়ানি ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের উপদেশে সভায় তিনি বরোদা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। কাশ্মীর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বেনিগ্যাল নরসিংহ রাও সংবিধান রচনা সভার নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলেও জুলাই ১৯৪৬ থেকে কমিটির পরামর্শদাতারূপে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সংবিধান রচনার শু(তে তাঁর নির্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান রচনার অভিজ্ঞতার সার নির্যাস একটি ''সাংবিধানিক উদাহরণ গ্রন্থ'' হিসাবে প্রণীত হয়েছিল।

(এইভাবে ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত হয়েছে।)

ভারতীয় সংবিধানে তিনটি মতাদর্শের সমন্বয় সাধিত হয়েছে ঃ— (১) উদারনৈতিক মতবাদ, (২) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং (৩) গান্ধীজির মানবিক ধ্যান-ধারণা। ব্যক্তি(স্বাধীনতা, নির্বাচন ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রভৃতি ছিল উদারনৈতিক চিন্তাধারার দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রের প্রতি নির্দেশাত্মক নীতির (Directive Principles) মধ্যে নেহে(র সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। গান্ধীজির কর্মসূচীর থেকে অস্পৃশ্যতা বর্জন, কুটিরশিল্পের প্রসার প্রভৃতি বিষয়গুলি গৃহীত হয়েছে।

গণ পরিষদে কংগ্রেস সদস্যদের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও ভারতের সংবিধানে সব ধরনের মতবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি খসড়া রাজস্ব কমিটি গণ পরিষদের কাছে সংবিধানের খসড়া জমা দেয়। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণ পরিষদে তা অনুমোদিত হয়। গণ পরিষদের সভাপতি হিসাবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাতে স্বা(র করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকরী হয়। ''প্রজাতন্ত্র দিবস'' হিসাবে এই দিন উদযাপিত হয়।

১.৫ গণতন্ত্রের ভিত্তি ঃ ধর্ম-নিরপে(তা, জনকল্যাণ এবং মৌলিক অধিকার

ধর্ম-নিরপে(রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্রকে যা ধর্মীয় রচনা দ্বারা পরিচালিত হয়। ধর্ম-নিরপে(রাষ্ট্র ধর্মহীন বা ধর্ম-বিরোধী রাষ্ট্র নয়। ধর্ম-নিরপে(রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমান মর্যাদা, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব বি(্বাস' এবং আচারানুষ্ঠান পালন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। আইন সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারকে সমভাবে র(া করে। নাস্তিক বা নিরী(্বরবাদীদের অধিকারও সমানভাবে র(া করা হয়। রাষ্ট্র কোন ধর্মমত আরোপ করে না। ধর্ম-নিরপে(তা নিছক আইনগত ও তাত্ত্বিক ধারণা নয়। ধর্ম-নিরপে(নীতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভাব-বিনিময়। উপযুক্ত(শি(া এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

ভারতীয় গণ পরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে এ. এস আয়েঙ্গার বলেন, ''ধর্ম-নিরপে('' শব্দের অর্থ এই নয় যে আমরা কোন ধর্মে বি(্বাস করি না কিম্বা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। ধর্ম-নিরপে(তার অর্থ হল রাষ্ট্র বা সরকার বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি প(পাতিত্ব করে না। গণ পরিষদের আলোচনায় ধর্মীয় প্রচারের ওপরও বিশেষ গু(ত্ব দেওয়া হয়েছিল। ধর্ম নিরপে(বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মমত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত। গণ পরিষদে আলোচনা কালে এই কারণে ডঃ কে. এম. মুসী, কে. শান্তনম প্রমুখ ধর্ম প্রচারের অধিকার স্বীকার করে নেন। তবে তা অবশ্যই অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রদর্শন না করে। ধর্মীয় মতান্ধতার কারণে ধর্মীয় প্রচারের অধিকারের আপ্রয়োগ ঘটতে পারে বলে কে. টি. শাহ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকত্ব প্রদানের (ে(ত্রে ধর্মীয় বিবেচনা বর্জন করা হয়েছে। সংবিধানের ২৫(১) নং ধারা অনুযায়ী ধর্মগ্রহণ, পালন এবং প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হলেও জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্য এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছাড়া ভারতীয় সংবিধানে অন্য যেসব মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলি হল ঃ — সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ নং ধারা) (২) স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ নং ধারা) (৩) শোষণের বি(দ্ধে অধিকার (২৩-২৪ নং ধারা) (৪) সংস্কৃতি ও শি(াগত অধিকার (৩১নং ধারা) (৫) সম্পত্তির অধিকার (৩১ নং ধারা) এবং (৬) সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২-৩৫ নং ধারা)। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪৪-তম সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে আইনসিদ্ধ অধিকাররূপে স্বীকার করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের ল(হল এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে নাগরিকদের মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ ও ব্যক্তি(ত্ব অর্জন সম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

মৌলিক অধিকার বিষয়ে আমাদের ধারণার পরিবর্তন ঘটে। কোন রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝার প(ে সেখানকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কতখানি এবং কি প্রকার তা জানা আবশ্যক।

সঙ্গে জড়িত নয় এমন অর্থনৈতিক (economic) আর্থিক (financial) এবং ধর্মীয় ত্রি(য়াকর্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। ২৫(২) ধারা অনুযায়ী সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধন অথবা দেবালয়ে হিন্দুদের শ্রেণী নির্বিশেষে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। জৈন, শিখ, এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিয়ম প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। শিখ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গু(দ্বার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সংবিধানের ২৬নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোন অংশ সেবাও ধর্মকার্যের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং তার জন্য সম্পত্তি অর্জন, র(ণাবে(ণ এবং ব্যয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও তাদের আছে। জনসাধারণের শৃঙ্খলা, নৈতিকতা কিম্বা স্বাস্থ্যের পরিপন্থী হলে অবশ্য এই অধিকার সংকুচিত হতে পারে। কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আচরণ অন্য সম্প্রদায়ের শান্তি ভঙ্গ করলে সরকারকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার (মতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান বলতে কি বোঝায় আদালত তা সং(-ষ্ট ধর্মীয় তত্ত্ব বি(ে-ষণ করে নির্দ্ধারণ করবে।

সংবিধানের ২৭নং ধারা বলে কোন বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও র(ণাবে(ণের জন্য ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি(বিশেষকে করদানে বাধ্য করা যায় না। সরকারী অনুদানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন শি(া প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শি(া প্রদান নিষিদ্ধ। সরকারের আর্থিক সাহায্য বা স্বীকৃতি-প্রাপ্ত কোন শি(া প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শি(ার ব্যবস্থা থাকলে শি(ার্থীর— বা শি(ার্থী অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তার অভিভাবকের— অনুমতি ব্যতীত ধর্মীয় শি(াগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না (২৮নং ধারা) অছি বা দানের মাধ্যমে গঠিত ধর্মীয় শি(ায়তন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও কিন্তু সেখানে ধর্মীয় শি(া নিষিদ্ধ করা যাবে না।

সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার র(ার দায়িত্ব ও (মতা বিচার বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকরা তাদের অধিকার বিষয়ে সর্বদা সচেতন এবং সংগ্রাম করতে প্রস্তুত না থাকলে রাষ্ট্র তাদের অধিকার হরণ বা (ুণ্ণ করতে পারে। পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদীরা নাগরিক অধিকারের দাবি বারবার উত্থাপন করেছিলেন। ১৯২৮-এ খ্রিষ্টাব্দে নেহে(রিপোর্টের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংখ্যালঘুদের অধিকার র(ার প্রসঙ্গ রির্পোটে গু(ত্ব পেয়েছিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়। পরে গণ-পরিষদের আলোচনা থেকে মৌলিক অধিকারের যে ধারণা ভারতীয় সংবিধানে প্রকাশ পায় অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সেখানে কোন শব্দ খরচ করা হয়নি। এটি ভারতীয় সংবিধানের একটি দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নি(ত হয়েছে। ইদানীং অবশ্য কাজের অধিকার সম্পর্কে সরকার সচেতন হয়েছেন।

ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখে গান্ধীবাদের তুলনায় পাশ্চাত্যের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাব বেশি দেখা যায়। উদাহরণগত, মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের বিল অফ রাইটস্-সহ উক্ত(সংবিধানের পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধন, মানব অধিকার বিষয়ে ফরাসী বিপ-বের সময়ে সংবিধান সভার ঘোষণা, আয়ারল্যান্ডের সংবিধানের বিভিন্ন ধারা এবং ইংরেজ সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডাইসী-র রচনার প্রভাব তাতে স্পষ্ট। গান্ধীজির আদর্শানুযায়ী পঞ্চায়েৎ গঠন মাদকদ্রব্য বর্জন প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় নিয়ামক নীতির অন্তর্ভূক্ত(হয়েছে।

মার্কিন সংবিধানে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্ব (theory of natural rights) স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতীয় সংবিধানে এরূপ কোন চিন্তা স্থান পায়নি। কেবলমাত্র সংবিধানের তৃতীয় অংশে সংযোজিত

অধিকার ব্যতীত ভারতীয় নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে কোন অধিকার দাবি করতে পারে না। ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার সমূহকে ইতিবাচক (Positive) এবং নেতিবাচক (Negative) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তবে এই দুইয়ের পার্থক্য স্পষ্ট নয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জীবন এবং ব্যক্তি(গত স্বাধীনতার অধিকারকে যদি আমরা ইতিবাচক জ্ঞান করি, তবে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তিদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেতিবাচক অধিকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। সংযোজিত অধিকারগুলি কতগুলি— যেমন দেশের ভিতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, মতপ্রকাশ কিংবা বসতি স্থাপন কেবলমাত্র নাগরিকদের জন্য সংর(িত। অন্যান্য অদিকার বিদেশীরাও ভোগ করতে পারে। তফশিলী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু অধিকার বিশেষভাবে সংর(িত। তফশিলী সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংবিধানের ১৯নং ধারা অনুযায়ী দেশে চলাফেরা এবং বসতি স্থাপনের (ে ত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায়। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন মাধ্যমে নাগরিকদের কর্তব্য বিষয়ে নির্দেশাবলী সংবিধানে প্রথম যুক্ত(হয়। কারণ, কর্তব্যবিহীন অধিকার সম্ভব নয়। অধিকার ও কর্তব্য বোধ পরস্পরের পরিপূরক।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি প্রধানত রাজনৈতিক ও আইনসিদ্ধ। সংসদের উভয় ক(ে দলগত প্রাধান্যের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার মৌলিক অধিকারের প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণেও মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রীয় হিত

ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির (Directive principles) বিশেষ গু(ত্ব আছে। আইনত কার্যকর না হলেও রাষ্ট্রের আদর্শ এদের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। বলা হয়েছে, তফশীলি জাতি এবং সমাজের অনগ্রসর অংশগুলির অর্থনৈতিক ও শি(ার উন্নতি বিধান এবং সামাজিক বৈষম্য থেকে তাদের র(া করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। বালক-বালিকাদের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শি(ার ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। স্ত্রী-পু(ষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে কাজের অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকের উপযুক্ত(বেতন এবং বেতনের বৈষম্যের দূরীকরণে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। শ্রমিক অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। বেকারদের বিশেষ সাহায্য দিতে হবে। বাস্তবে এইসব নীতি অনেক সময় কার্যকর করা সম্ভব না হলেও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ এইসব নীতির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতাদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য এইসব নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

একক ২ ❑ জওহরলাল নেহে(র নেতৃত্বে ভারতবর্ষ

গঠন ঃ

২.১ রাজ্যের পুনর্বিন্যাস

২.২ নেহে(র উদারনীতিবাদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ সাধারণ নির্বাচন

২.৩ নেহে(র নেতৃত্বে কংগ্রেস

২.৪ নেহে(ও বিরোধী পথ

২.১ রাজ্য পুনর্বিন্যাস

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন বিভাগে ২৮টি রাজ্য গঠিত হয়েছে। রাজ্যগুলির সীমা নির্দ্ধারণে ভাষা বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুর্নগঠন কমিশন গঠন করেছিল। কমিটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বি(দ্ধে মত প্রকাশ করে। কিন্তু ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অবিভক্ত(মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সংখ্যাগরিষ্ঠ তেলেগু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবিতে পট্টি শ্রীরামালু অনশন ধর্মঘটে প্রাণ দেন। পরিণামে সমগ্র অন্ধ্র অঞ্চল জুড়ে ব্যাপক গণ আন্দোলন শু(হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৩ সালের ১লা অক্টোবর অন্ধ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন পুনরায় গঠিত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট কমিশনের প্রতিবেদনভিত্তিক একটি খসড়া আইন পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করার পর সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন সাধিত হয়। ফলে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সমগ্র দেশ ১৪টি রাজ্য এবং ২টি কেন্দ্র-শাসিত ইউনিয়ন অঞ্চলে পুনর্বিন্যস্ত হয়।

ভারতে জাতি সমস্যার সমাধান এর দ্বারা হয়নি। মহারাষ্ট্র থেকে গুজরাটকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলন শু(হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র (রাজধানী বোম্বাই) এবং গুজরাট (রাজধানী আহমেদাবাদ) দুটি পৃথক রাজ্য হিসাবে দেখা দেয়।

আকালী দলের চাপে সরকার ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাবকে দ্বিভাষিক রাজ্য ঘোষণা করে। এই রাজ্যে পাঞ্জাবী ভাষাভাষী হিন্দু এবং হিন্দি ভাষাভাষী শিখরা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল। পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ ছিল শিখ। হিন্দী এবং পাঞ্জাবি ভাষাভাষী অধ্যুষিত আঞ্চলগুলিতে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিন্দি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় শি(াদানের ব্যবস্থা চালু হয়। সরকারী কাজকর্মে ইংরিজি এবং উদু ভাষার ব্যবহার আগের থেকে বজায় ছিল। এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের নির্বাচনে আকালী দল পাঞ্জাবি ভাষাভাষী জনগণের জন্য একটি পৃথক রাজ্য গঠনের ডাক দেয়। বহু সংগ্রামের পর ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত(হয়। হিন্দি ভাষাভাষী অধ্যুষিত হরিয়ানা স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

নেহে(প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে ১৯৫১-৫২ সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (২৫ অক্টোবর ১৯৫১-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। ভারতীয় গণতন্ত্রের প(এটি ছিল এক অগ্নিপরী(া। ভারতের মতো বিশাল দেশে, যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্মে বিভক্ত(এত বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস, সংসদীয় ব্যবস্থার সাফল্য বিষয়ে অনেকেই

সন্দিহান ছিলেন। দেশের সত্তর ভাগের বেশি মানুষ নির(র। ভাষাগত মিল তাদের মধ্যে ছিল না। আধুনিকতার আলো অধিকাংশ জায়গায় পৌঁছায়নি। সংসদীয় নির্বাচনের কোনরূপ অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না। এরকম অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দু(হতা অকল্পনীয়। নেহে(কিন্তু নিরাশ হননি। নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধানের শর্ত অনুযায়ী একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। নির্বাচন সংত্র(ান্ত সকল বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয়। লোকসভায় মোট ৪৮৯ এবং রাজ্য বিধানসভায় ৩২৮৩টি আসন ছিল।

নির্বাচনের জন্য সারা দেশ জুড়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়। একুশ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী সকল নাগরিককে ভোট দানে উৎসাহিত করা হয়(মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৩০ ল(। পৃথিবীর আর কোথাও এত ভোটার এর আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। প্রতি এক হাজার ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র হিসাবে ২ ল(২৪ হাজার ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২৫ ল(ব্যালট বাক্স এবং ৬২ কোটি ভোটপত্র প্রয়োজন হয়। ১০ ল(সরকারী কর্মচারী ভোট পর্বের সঙ্গে যুক্ত(ছিল। প্রত্যেক প্রার্থীর নামে ভোট কেন্দ্রে পৃথক ব্যালট বাক্স রাখা ছিল। প্রত্যেক প্রার্থীকে একটি প্রতীকচিহ্(দেওয়া হয়। ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর ভোট বাক্সের ওপর সেই চিহ্(অঙ্কিত থাকত। ভোটাররা পছন্দ মতো প্রার্থীর সমর্থনে একটি করে ভোট দিতেন। এই নির্বাচনে ১৪টি জাতীয় দল, ৬৩টি আঞ্চলিক দল এবং বহু সংখ্যক নির্দল প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৭,৫০০। তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য লোকসভায় ৯৮টি এবং বিধানসভায় ৬৬৯টি আসন সংর(ত ছিল।

ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভোটের দিন অনেক জায়গায় উৎসবের চেহারা নেয়। জনসাধারণের উৎসাহ ছিল দেখবার মতো। মোট ভোটদাতাদের ৪৬.৬ শতাংশ ভোট দেয়। মহিলা ভোটারদের প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। প্রায় ৩ থেকে ৪ শতাংশ ভোট বাতিল হয়। ভারতে ভোট যজ্ঞের এই সাফল্যে বি(্বাসী চমৎকৃত হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অভিজ্ঞতা বর্ণনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

উত্তর-পূর্ব ভারতেও জাতি সমস্যা তীব্রতা লাভ করে। নাগা, মিজো, লুসাই প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে ১৯৫০-এর দশকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এ. জেড. ফিজো-র নেতৃত্বে স্বাধীন নাগা রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে এই দাবি মেনে নেওয়া হয়। মিজো উপজাতিকে অনুরূপ আন্দোলনের পথে পরিচালিত করেন লালডেঙ্গা। আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(পার্বত্য অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, অ(ণাচল প্রদেশ, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্য গঠিত হয়।

২.২ নেহে(র উদারনীতিবাদ এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ঃ সাধারণ নির্বাচন

ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমষ্টিকরণের প্রতি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহে(র সমান আকর্ষণ ছিল। ইংল্যান্ডে শি(ালাভের ফলে ছাত্র বয়স থেকেই তিনি পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন। আবার চোখের সামনে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টাও তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত নিপীড়িত জাতিসমূহের এক মহাসভায় (Compress of Oppressed Nationalities) তিনি প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন ভারতের মুক্তি(যুদ্ধকে তিনি তখন থেকেই ভারতের মুক্তি(যুদ্ধকে তিনি আন্তর্জাতিক (ে ত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অংশ হিসাবে বিবেচনা করেন। গান্ধীজি তাঁর উত্তরসূরী

হিসাবে নেহে(কে নির্বাচন করেছিলেন। গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা নেহে(কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আন্তর্জাতিক (ে ত্রে শান্তির বাণী তিনি প্রচার করেন। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সংহতি সম্ভব নয়, তিনি বুঝেছিলেন। সমানাধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম-নিরপে(কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনের পথে নেহে(দেশকে পরিচালিত করেছিলেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যে এই নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে কংগ্রেসের জয়-জয়কার দেখা গেল। লোকসভায় ৭৫% এবং বিধানসভায় ৬৮.৫% আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয়ী হয়। মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, উড়িষ্যা এবং পেপসু (অর্থাৎ Patiala and East Panjab States Union) বাদে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে কংগ্রেসের সাফল্য ছিল নিরঙ্কুশ। এমনকি এইসব রাজ্যেও ভোট দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। পরবর্তী দেড় দশক ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের একদলীয় প্রাধান্য বজায় ছিল। বিরোধীরা কোনমতে তাদের অস্তিত্ব র(া করে। নেহে(র জীবদ্দশায় ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা পুনরায় প্রমাণ হয়। এই দুটি নির্বাচনে ভোটদাতাদের হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালে গড়ে ৪৭% এবং ১৯৬২-তে ৫৮% ভোট প্রদান করা হয়।

২.৩ নেহে(র নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহে(দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবি গৃহীত হয়। দলে ত(ণ অংশের নেতা হিসেবে তিনি প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। গান্ধীজি তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে জওহরলালকে নির্বাচিত করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অন্তর্বর্তীকালনী সরকারের তিনি-ই ছিলেন প্রধান। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে বল্লভভাবই প্যাটেলের মৃত্যুর পর দলে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দলের যাবতীয় কর্মসূচী তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত হয়। দলীয় প্রার্থী নির্বাচন থেকে দলের নীতি নির্ধারণ, ইস্তাহার রচনা, প্রচারাভিযান প্রভৃতি প্রত্যেকটি পদ(ে পে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। মাত্র ৪৩ দিনে তিনি ৪০ হাজার কিলোমিটার পথ পরিত্র(মা করেন। ধর্মনিরপে(তা এবং জাতীয় সংহতির ভিত্তিতে তিনি একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদন নিয়ে জনসাধারণের কাছে পৌঁছান। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরাট সাফল্য তাঁর বক্ত(ব্যের প্রতি সমর্থন হিসাবে ধরা যায়। নেহে(ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। ভারতে সেকুলার রাষ্ট্র গঠনের পিছনে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে তিনি এই মর্মে আবেদন রেখেছিলেন।

কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে কংগ্রেসের প্রাধান্য প্র(োতীত হওয়ায় দলীয় মতে সংগঠনে শিথিলতা দেখা দেয়। প্রথম সারির নেতারা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অপে(াকৃত ত(ণ এবং কম যোগ্যতাসম্পন্ন নেতারা তাদের স্থান গ্রহণ করে। দলীয় কাজ কর্মে বিচ্যুতি দেখা দেয়। এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য কামরাজ পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কিন্তু সংস্কার সাধনে তা ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস এবং নেহে(তখন ছিল প্রায় সমার্থক। ফলে নেহে(র উতরসূরী কে হবেন, সেই প্র(ে নেহে(র জীবদ্দশার শেষ দিকে গু(ত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কন্যা ইন্দিরার প্রতি নেহে(র প(পাত কা(র অজানা ছিল না। নেহে(বংশের ঐতিহ্য ইন্দিরা গান্ধী বহন করে চলেন।

২.৪ নেহে(এবং বিরোধী প(

জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও নেহে(সমালোচনা কণ্ঠরোধ করেননি। কংগ্রেস

নীতির সমালোচনায় বাম এবং দ(িণপন্থী দলগুলি সরব হতে পারত। সংসদে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামমোনহর লোহিয়া, জে. বি. কৃপালনী, মিলুমাসানী, এন. জি. রঙ্গ, এ. কে. গোপালন, ভূপেশ গুপ্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাংসদের আলোচনায় সভাক(উত্তপ্ত হয়ে উঠত। কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সহযোগী দলগুলি পার্লামেন্টে সবচেয়ে শক্তি(শালী ছিল। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কেরলে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের হস্ত(েপে তা অল্পকালের মধ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এই ঘটনা ছিল সুস্থ গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির বিরোধী এবং অত্যন্ত দুঃজনক।

১৯৫১ সালের নির্বাচনের আগে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ''জনমুঙঘ'' দল গঠন করেন। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের নীতি তোষণমূলক বলে এই দল অভিযোগ করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের প্রতি সরকারের আর সহানুভূতিশীল এবং বলিষ্ট নীতি গ্রহণ করা উচিত বলে ডঃ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন। কা্মীরকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করার তিনি বিরোধী ছিলেন। কা্মীর প্রবেশ করতে তখন পাসপোর্ট প্রয়োজন হত। ডঃ মুখার্জী এই নিয়ম অমান্য করে কা্মীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করায় গ্রেপ্তার হন। কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয় (২৩শে জুন ১৯৫৩)। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃষ্টান্ত নেহে(কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ মিলিয়ে তিনি মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। অর্থনীতিতে ব্যক্তি(গত উদ্যোগকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে চক্র(বর্তী রাজাগোপালাচারী, এন. জি. রঙ্গ, মিনু মাসানী প্রমুখ ''স্বতন্ত্র'' দল গঠন করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে দেখা যায় বিরোধী দলগুলির বক্ত(ব্য দেশের মানুষের মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। লোকসভায় কমিউনিস্টরা প্রায় ১০% ভোট পায়। স্বতন্ত্রের সংগ্রহে ছিল ৮% এবং জনসঙেঘর ৭% ভোট। উড়িষ্যা, বিহার, রাজস্থান এবং গুজরাটে স্বতন্ত্র ছিল কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপ(। পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

একক ৩ ❑ স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায় বিচার

গঠন ঃ

৩.০ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি

৩.১ নেহে(র নেতৃত্বে শিল্প-সংস্কৃতি নীতি

৩.২ সামাজিক ন্যায় বিচার আন্দোলন

৩.০ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিষয়ে ভাবনা চিন্তা হয়েছিল স্বাধীনতার আগে। সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে স্টালিনের নেতৃত্বে। ভারতীয়রা এই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়। মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া ১৯৩৪ সালে Planned Economy of India নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর চার বছর পর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসু একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। জওহরলাল নেহে(তার সভাপতি এবং অধ্যাপক টি. কে. শাহ এই কমিটির সচিব নিযুক্ত(হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জোয়ারে নেতাদের দৃষ্টি অন্যত্র আবদ্ধ থাকায় ১৯৪৮ সালের আগে কমিটির প(রিপোর্ট জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের আটজন বিশিষ্ট শিল্পপতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেন। বোম্বাই পরিকল্পনা বা টাটা পরিকল্পনা নামে তা পরিচিত। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম বিশদ রূপ এতে পাওয়া যায়। বিপরীতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি ''গণ পরিকল্পনা'' পেশ করেন। বোম্বাই পরিকল্পনাতে শিল্পোদ্যোগের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গণ পরিকল্পনায় কৃষির ওপর গু(ত্ব আরোপ করা হয়। গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এস. এন. আগরওয়ালা এই সময়ে অন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। কিন্তু এর কোনটিই বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আবির্ভাব, বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং তুলো, পাট, খাদ্যশস্য প্রভৃতির ঘাটতি যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে পরিকল্পনা মাধ্যমে তা মোকাবিলা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ১৯৪৮ সালে আণবিক শক্তি(এবং অস্ত্রোৎপাদন ও রেলপরিবহন মতো কতগুলি শিল্পের দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করে আর কতগুলি শিল্প বেসরকারী হাতে দেওয়া হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নেহে(র সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৫১ সালে এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশভাগের ফলে ভারতের অর্থব্যবস্থা যে বৈষম্যের তার প্রতিকার এবং (২) উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভারতবাসীর মানের উন্নতি এবং পূর্ণতর ও অধিক বৈচিত্র্যময় জীবযনাপনের সুযোগ বৃদ্ধি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ((ত্রে ব্যয় হয়েছিল ১,৯৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষিতে এবং জলসেচ ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য শতকরা ৪৫.২ ভাগ ব্যয় হয়। শতকরা মাত্র ৪.৯ ভাগ শিল্পে শিল্পবিকাশের প্রয়োজনে ব্যয় হয়। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য চলতি রাজস্ব থেকে উদ্বৃত্তের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছিল। মোট ৩৭২ কোটি টাকা এই খাতে সংগ্রহ করা হয়। রেলপথ থেকে উদ্বৃত্ত ১১৫ কোটি টাকা পরিকল্পনা

রূপায়িত করতে ব্যয় হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার ফল মোটের ওপর সন্তোষজনক ছিল। ভারতের জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি লাভ করে। অতিরিক্ত(৪৫ ল(কাজ প্রত্য(ভাবে সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ স্থিতাবস্থার পর ভারতীয় অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়। কৃষির উৎপাদন ২২ শতাংশ এবং শিল্পোৎপাদন ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও আয়তন ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক ধাচের সমাজ ব্যবস্থা ভারতের ল(হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনায় প্রধান ল(ছিল— (১) জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি (২) দ্রুত শিল্পায়ন (৩) অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং (৪) সম্পদ ও আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমবণ্টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদনের ল(৬১৬ টন ধার্য করা হলেও কার্যত তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৫০ ল(টন। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ে ত্রে কিছু অগ্রগতি হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প বেশি গু(ত্ব পায়। কৃষি ও জলসেচের জন্য মোট ব্যয়ের ২০.৯ শতাংশ ধার্য হয়, বৃহৎ শিল্প এবং পরিবহনের ওপর সে(ত্রে ব্যয় হয় ৪৭.১ শতাংশ। পরিকল্পনায় ইস্পাত উৎপাদনের ল(৪০ ল(টন ধার্য করা হয়ছিল। দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রৌরকেল্লায় তিনটি নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হয়। রেলের ইঞ্জিন, ওয়াগন প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করা হয়। কর্মনিযুক্তি(র সুযোগ বৃদ্ধি এবং আয়-ব্যয়ের বৈষম্য হ্রাসের ে ত্রে প্রধানত শ্রমনির্ভর (দ্রশিল্পের গু(ত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। ভোগ্যদ্রব্যের যোগান-বৃদ্ধির ে ত্রে (দ্র এবং গ্রামীণ শিল্পের বিশেষ ভূমিকা রাষ্ট্রের উৎসাহ লাভ করে। উন্নয়নের এই ছক বিশিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নামানুসারে ''মহলানবীশ মডেল'' নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হলেও তীব্র বৈদেশিক মুদ্রা সংকেটর কারণে পরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় সংকোচ করা হয়। পরিকল্পনার মূল কার্যত্র(ম এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সম্ভব হলে, ভবিষ্যতে পরিকল্পনার অন্যান্য দিকগুলি রূপায়নের চেষ্টা হবে বলে আ(াস দেওয়া হয়। চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্তের ওপর নির্ভরতা অনেক কমিয়ে অর্থসন স্থানের জন্য ঘাটতি ব্যয় (অর্থাৎ অতিরিক্ত(নোট ছাপানো পদ্ধতি) এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর করা হয়। ঘাটতি ব্যয় থেকে মোট ৯৫৪ টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ১০৪৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। জনসাধারণের থেকে ঋণ ও (দ্র সঞ্চয় বাবদ ১১৭৮ কোটি টাকা এবং আমানত ও প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি থেকে ২১৬ কোটি টাকা আদায় হয়। পরিকল্পনার প্রয়োজনে ১০৫২ কোটি টাকা অতিরিক্ত(কর হিসাবে সংগ্রহ হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফল আশানুরূপ হয়নি। দ্রব্যমূল্যস্ফীতি ছিল ৩০ শতাংশ, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঘটে মাত্র ২০ শতাংশ। কৃষি(ত্রে উৎপাদনের ল(ছিল ৮ কোটি ৫০ ল(টন। কিন্তু বস্তুত ফলন হয় ৭ কোটি ৯৭ ল(টন। বৈদেশিক লেনদেনের অনুমিত হিসাব ছিল ১,১০০ কোটি টাকা। কিন্তু বাস্তবে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৯২০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৬১-৬৬। সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের পথে এবারের প্রধান ল(হল—

(১) পরিকল্পনা কালে বাৎসরিক পাঁচ শতাংশ বা তার বেশি কিছু হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে এই হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত(বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।

(২) খাদ্যশস্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ এবং শিল্প ও রপ্তানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

(৩) পরবর্তী এক দশক কালের মধ্যে ভারতে শিল্পবিকাশের ল(্যে আভ্যন্তরীণ মূলধন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইস্পাত, রাসায়নিক পদার্থ, যন্ত্রাংশ এবং শক্তি(ও জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি

(৪) দেশের জনশক্তি(বা লোকবলের সম্পূর্ণ ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে কৃষি(ে ত্রে চরম ব্যর্থতার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি আবার গু(ত্ব পায়। খাদ্য শস্য উৎপাদনের ল(্য দশ কোটি টাকা নির্ধরিত হলেও বাস্তবে মাত্র ৭.২ কোটি টন উৎপাদন হয়। দ্রব্যমূল্যস্ফীতি যেখানে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ শতাংশ, সেখানে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৪ শতাংশ। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১.১৩৩ কোটি টাকা। অতিরিক্ত(কর বাবদ ২,৮৯২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। বৈদেশিক সাহায্যে পরিকল্পনার ২০ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ হয়। ১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনার কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়।

সমগ্র বিচারে, ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফল প্রত্যাশা পূরণ করেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর তিন বছর নতুন কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করা হয়নি। দেশের ভিতর খরা এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে পরিকল্পনা কার্যকর করার মতো অর্থ সরকারের হাতে ছিল না। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ শু(হয় ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে।

৩.১ নেহে(র নেতৃত্বে শিল্প ও সংস্কৃতি নীতি

১৯৫৬ সালে সমাজতান্ত্রিক আদলে সমাজব্যবস্থা এবং দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ল(্যাভিমুখী শিল্পনীতি ভারতে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী পদে নিযুক্ত(থাকার সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত শিল্পনীতিতে এর মূল সন্ধান করা যায়। জাতীয় সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি এবং সাধারণের মধ্যে তার যথাযথ বণ্টন, এই নীতির প্রধান ল(্য বলে ডঃ মুখার্জী বর্ণনা করেন। এর দ্বারা জাতীয় অর্থনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ে(ত্র চিহ্নি(ত করে মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের শিল্পনীতি এরই পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ। এর দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের পরিধি বিস্তার ঘটে। ১৭টি শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এগুলি হল— আণবিক শক্তি(র উৎপাদন, বিদ্যুৎ শক্তি(র উৎপাদন ও বণ্টন, জাহাজ ও বিমান নির্মাণ, রেল ও বিমান পরিবহন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবা(দ উৎপাদন, টেলিফোন এবং টেলিফোনের তার উৎপাদন, এবং ইস্পাত, লৌহ, হীরা, কয়লা, খনিজ তেল, স্বর্ণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ আনবিক শক্তি(র উৎপাদন, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবা(দ উৎপাদন এবং রেল ও বিমান পরিবহন কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। অন্যান্য ে(ত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলি নিজেদের সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেলেও সরকার কেরল নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবে।

রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী উদ্যোগের ে(ত্র হিসাবে ১২টি শিল্প চিহ্নি(ত হয়। এগুলি হল— মেসিনের অংশ এবং বিভিন্ন যন্ত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, অ্যালুমিনিয়াম সড়ক ও সামুদ্রিক পরিবহন, খনিজ শিল্প, অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ, প-াস্টিক, রাসায়নিক মণ্ড। এগুলি ত্র(মশ রাষ্টায়ত্ত করার ল(্য ঘোষণা করা হল। আপাতত এগুলির ে(ত্রে বেসরকারী শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠার ে(ত্রে বাধা ছিল না। এমনকি সরকার ইচ্ছা করলে এইসব ে(ত্রে কোন বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত(হতে পারত। গু(ত্ব বুঝে সরকার এইসব ে(ত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারত।

এরপরও বেসরকারী উদ্যোগের একটি বিস্তৃত ে(ত্র ছিল সরকার যার প্রতি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে। সমবায়িক ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠা দেশের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সরকার মনে করত।

ওপরের এই শ্রেণী বিভাগ যে বাস্তবে সর্বদা মেনে চলা হবে, এমন প্রতিশ্রুতি সরকার ১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে দেয়নি। বরং বেসরকারী ে ত্রেও প্রয়োজন বোধে সরকার শিল্প গড়ে তুলবে বলে জানানো হয়। কর্মনিযুক্তি(র সম্ভাবনার বৃদ্ধি এবং সম্পদ বণ্টনে ে দ্র ও গ্রামীণ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার তার পৃষ্ঠপোষকতা করবে বলে জানানো হয়। অর্থনীতির সুক্ষ্ম বিকাশের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সুদ(কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীবৃন্দ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে শিল্পে অর্থ যোগানের জন্য সরকার-কর্তৃক একটি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে সরকার কতকগুলি বেসরকারী শিল্প নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন গঠিত হয়।

এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ভারতে শিল্পের বিকাশকে বিশেষ ত্বরান্বিত করতে পারেনি, পরবর্তীকালের মন্দা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেও স(ম হয়নি। একচেটিয়া পুঁজির বিস্তার ঘটেই চলে। ১৯৭৩ সালে সরকার শিল্পনীতি সংশোধনে বাধ্য হয়।

নেহে(কেবল রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা ভাবুক প্রকৃতির। ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তাঁর লেখা Discovery of India গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আত্মচরিত (Autobiography) গ্রন্থে নেহে(সমকালীন ভারতের পটভূমিকায় তাঁর জীবন বর্ণনা করেছেন। জেল থেকে কন্যা ইন্দিরাকে লেখা চিঠিগুলি ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহে(র কবিসুলভ উদার ভাবুক অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ভারতবাসীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে তিনি উৎসাহী ছিলেন। জাতীয় স্তরে সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতির জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমী এবং ললিত কলা আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞান চর্চার ে ত্রেও ভারতবর্ষে এসময়ে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। করে। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় জওহরলালের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সং(েপ সি. এস. আই. আর.)। বিজ্ঞান এবং কারিগরী ে ত্রে গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে বহু গবেষণাগার স্থাপিত হয়র। ১৯৪৮ সালে পরামাণবিক গবেষণার জন্য অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি। নেহে(বলতেন— ভারি শিল্প হল আধুনিক ভারতের মন্দির। ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি প্রচারে নেহে(বিশেষ গু(ত্ব দেন।

৩.২ সামাজিক ন্যায়বিচারের আন্দোলন

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং নির্দেশাত্মক নীতিসমূহে সকলের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে। নেহে(দেশবাসীকে এ বিষয়ে তাঁদের কর্তব্য পালনে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে বারবার নির্দেশ দেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ল(্য ঘোষণা করে সামাজিক ন্যায়বিচারকে স্বীকৃতি জানানো হয়। আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে— উপজাতি কল্যাণ, তফসিলি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (৩) নারী প্রগতি (৪) গ্রামোন্নয়ন এবং (৫) শি(া বিস্তার।

উত্তর-পূর্ব ভারত, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের পাহাড় এবং বন মিলিয়ে এদেশে প্রায় ৪০০ উপজাতি গোষ্ঠীর বাস। ভারতের মোট জনসংখ্যার তারা প্রায় চার শতাংশ। ভারতীয় সংবিধানের ৪৬ নম্বর ধারায় উপজাতিদের সামাজিক মানোন্নয়ন এবং তাদের মধ্যে (আধুনিক) শি(ার বিস্তারের ওপর বিশেষ

গু(ত্ব দেওয়া হয়েছে। সামাজিক শোষণ এবং বৈষম্যের থেকে মুক্তি(দিয়ে জাতীয় জীবনের মূল ধারায় তাদের অন্তর্গত করার ল(ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য আদিবাসী উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। উপজাতিদের জন্য বিভিন্ন (ে ত্রে পদ সংর(ণের ব্যবস্থা আছে। আদিবাসী সংস্কৃতি র(ার জন্যও উপযুক্ত(ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা ভারতে সামাজিক বিভাজনের অন্যতম কারণ। দলিত নেতা বি. আর. আম্বেদকর নিজে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের মানুষদের ঘৃণায় দূরে রাখতেন। অন্ত্যজদের ''হরিজন'' নামে গান্ধীজী অভিহিত করেন। তাদের দেবালয়ে প্রবেশের অধিকারের জন্যও তিনি সংগ্রাম করেন। ভারতীয় সংবিধানে ১৭নং ধারায় অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং ৩৩০-৩৪২ ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার উল্লেখ রয়েছে। ১৯৫৫ এবং ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের দুটি আইনে অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে স্ত্রী-পু(ষের সমান অধিকার। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী পু(ষরা এক স্ত্রীর বর্তমানে অন্য দার পরিগ্রহ করতে পারে না। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এখনও প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

গ্রামীণ উন্নয়নের পথে প্রথম গু(ত্বপূর্ণ পদ(ে প ১৯৫২ সালের সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী (Community Development Programme)। ৫৫টি ব্লক নিয়ে এই কর্মসূচী শু(হয়েছিল। প্রতিটি ব্লকের নিচে ছিল ১০০টি গ্রাম। পরবর্তী এক দশকের মধ্যে সমস্ত দেশকে এই কর্মসূচীর অধীনে আনা হয়। এই প্রকল্পটি কার্যকর করার দায়িত্বে ছিলেন ৬০০০ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (ব্লক ডেভালেপমেন্ট অফিসার, সং(ে পে বি.ডিও) এবং ৬ ল(গ্রামসেবক। নেহে(এই পরিকল্পনাকে ভারতের উজ্জীবনের প্রতীক-রূপে গণ্য করলেও শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিকতার ফাসে এর গতি (দ্ধ হয়। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নিযুক্ত(বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি-র অনুসন্ধানে ধরা পড়ে গ্রামের গরীব মানুষদের তুলনায় এই কর্মসূচী থেকে গ্রামের বিত্তবান শ্রেণীর বেশি সুবিধা লাভ করছে। এরপর পঞ্চায়েৎ মাধ্যমে (মতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অধিক সংখ্যক গ্রামবাসীকে কাজে যুক্ত(করার নীতি গ্রহণ করা হয়।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ল(ে্য শি(া বিস্তারের ওপর সরকার গু(ত্ব দেয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬.৬ ভাগ ছিল শি(িত। গ্রামে এই হার ছিল আরও কম— মাত্র ছয় শতাংশ। সংবিধানে বলা হয়েছিল ১৯৬১ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক শি(ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও সকলকে স্বা(র করা সম্ভব হয়নি।

একক ৪ ❑ বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)

গঠন ঃ

৪.০ বিশ্বরাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)

৪.১ ভারত ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ, নির্জোট আন্দোলন

৪.২ ভারত ও বিশ্ব শক্তি(বর্গ

৪.৩ ভারত ও চীন

৪.৪ ভারত ও পাকিস্তান

৪.৫ ভারত ও দ(িণ ও দ(িণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ সমূহ

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ বিশ্বরাজনীতিতে ভারত (১৯৪৭-৬৪)

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৪৭-৬৪) ঃ

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা জ(রী। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়। ফ্যাসিবাদী শক্তি(র পরাজয় ঘটে এবং মিত্রশক্তি(বিজয়ী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল না। এল ঠাণ্ডা লড়াই (cold war)-এর যুগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব দুটি বিবাদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত(হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলি। অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদের মতাদর্শ বিশ্ব থেকে নির্মূল করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকেই মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র সহ পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তিক্ত(রপূ ধারণ করতে শু(করে। ইয়াল্টা ও পট্সডাম সম্মেলনে এই তিক্ত(সম্পর্ক স্পস্টভাবে ধরা পড়ে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সুল্টন বক্তৃ(তা সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে সাহায্য করে। চার্চিল কমিউনিস্টদের ''বিশ্বাসঘাতক ও সভ্যতার শত্রু'' বলে চিহ্নি(ত করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের তরফে ১৯৪৭-এর ১২ মার্চ ট্রুম্যান নীতি ও ৫ জুন মার্শাল পরিকল্পনা এর ঘোষণা সরাসরি ঠাণ্ডা লড়াই এর সূচনা করেছিল। স্ট্যুমান নীতিতে বলা হয়েছিল বিশ্বের যে অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটবে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র সেখানে সামরিক সাহায্য দেবে। আর বিশ্বের অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশগুলির আর্থিক পুনর্গঠনের কথা ঘোষণা করে মার্শাল পরিকল্পনা। এই পদ(েপগুলির সমর্থনে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের তরফের থেকে বলা হয়েছিল— ''আমেরিকাকে আর্থনীতিক অনগ্রসর এলকাগুলিতে

সামরিক অভিভাবক বজায় রাখতে হবে যাতে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান আমেরিকার গু(ত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করতে না পারে।''

আমেরিকা-যুক্ত(রাষ্ট্র তার আগ্রাসী ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রীয় চরিত্রের কারণে কোন বি(দ্ধ রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব শুধু যে অপচ্ছন্দ করত তা নয়, তাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যেকোন সামরিক পদ(েপ নিতে দ্বিধা করত না। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের অনুগত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি ১৯৪৮ সালে NATO গঠন করে। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রের বি(েব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই অভিব্যক্তি(ছিল ঠাণ্ডা লড়াই। এই ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির প্রে(াপটেই ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বুঝতে হবে।

৪.১ ভারত ও ঠাণ্ডা যুদ্ধ ঃ নির্জোট আন্দোলন এবং জোট নিরপে(নীতি

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ঘোষিত ভিত্তি ছিল জোটনিরপে(নীতি (Policy of Non-alignment)। জোটনিরপে(তা নীতির প্রবক্ত(া ছিলেন ভারতের প্রথম প্রধামন্ত্রী জওহরলাল নেহে(। ঠাণ্ডা লড়াই এর সূচনাপর্ব থেকেই জোটবদ্ধ মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া তাঁদের নিজেদের প(সমর্থন খুঁজছিল। কিন্তু এই দুই শান্তিজোটের কোনটিই ভারতের কাছ থেকে স্থায়ী সমর্থন ও প্র(োতীত আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি পায়নি। ভারত এই দুই গোষ্ঠীর কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত(হয়নি। এটাই ছিল ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা জোট নিরপে(তা। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহে(বলেছিলেন— ''ভারত সরকারের কতকগুলি মৌলিক উদ্দেশ্য অছে। সেগুলি হল ভারত তার স্বাধীনতা বজায় রাখবে, জাতিগত বৈষম্য ভারত থেকে অপসৃত হবে এবং দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অশি(া ভারত থেকে দূর করা হবে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে প্রতিটি বিতর্কিত বিষয়ের প্রতি স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে, কোন বৃহৎ শক্তি(র সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে নয়।'' কে. এম. পানিক্কর বলেছেন— ভারত নিজেকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেনি, জোটনিরপে(নীতির মাধ্যমে নিজের স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রেখেছিল।

১৯৫০-এর দশকের জোটনিরপে(নীতি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। এই নীতি গ্রহণের (ে ত্রে ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টিও গু(ত্ব পেয়েছিল। কোন প(অবলম্বন না করায় ভারতের কোন বড় যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে, এই অর্থে জোটনিরপে(তা নীতিকে ভারতের প্রতির(া নীতিও বলা চলে। ভারতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল তার জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা। এর ফলে নিজস্ব স্বার্থ পুরণে ও নীতি নির্ধারণে ভারতের অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসবে। আন্তর্জাতিক (ে ত্রে ভারতের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হবে। তা উপনিবেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষের পতনে সহায়ক হবে এবং এশিয়ার নবজাগৃতিকে শক্তি(শালী করবে। তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল একটি 'তৃতীয় অঞ্চল'-এর র(ণ ও সম্প্রসারণ যা—শক্তি(র(ার জন্য মধ্যস্থের কাজ করবে এবং তা পরস্পর বিরোধী শক্তি(গোষ্ঠীর অন্তর্বর্ত্তী অংশ হিসাবে বিরাজ করবে। ভারতের এই জোট নিরপে(তাকে আন্তর্জাতিক (ে ত্রে নিরপে(তা মনে করলে ভুল হবে। এই জোটনিরপে(তা ছিল আন্তর্জাতিক রাজীনতিতে অংশগ্রহণ করার একটি কৌশল। ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত(থেকে এই জোট নিরপে(নীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গু(ত্বপূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এই আন্দোলনকে শক্তি(শালী করতে ভারতের নেহে(, মিশরের নাসের এবং যুগো(োভিয়ার টিটো সক্রি(য় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শক্তি(সাম্য নীতির প্রবক্ত(রা অবশ্য জোটনিরপে(নীতির কার্যকর ভূমিকা নিয়ে গু(ত্বপূর্ণ প্র্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির পরিপ্রে(তে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি শান্তির ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। একটি দেশ এই শক্তি(সাম্য ধরে রাখতে পারে তার সামরিক শক্তি(র মাধ্যমে। কিন্তু এর উত্তরে নেহ(বলেছিলেন, কোন জাতির শান্তি ও স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে সে কখনোই নিরপে(হয়ে বসে থাকতে পারেনা। বিপানচন্দ্র বলেছেন নির্জোট বলতে নেহে(কখনোই নিরপে(তা বোঝাননি। কোন আন্তর্জাতিক বিষয়ের গুণাগুণ বিচারের (ে ত্রে তিনি স্বাধীনতা উপভোগ করতে ও সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নেহে(নিজেও বলেছিলেন— ''ঠাণ্ডা লড়াই ও তার সং(-ষ্ট সামরিক চুক্তি(গুলির (ে ত্রে আমরা নির্জোট। বি(্বের প(ও আমাদের প(যা (তিকর তা আমরা নির্দিধায় নিন্দা করব।'

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে প্রাথমিক পর্বে ভারতের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করেছিল বিদেশী রাষ্ট্রের উদার আর্থিক সাহায্যের ওপর। জোটনিরপে(নীতি অবলম্বন করে ভারত তাই কোন বৃহৎশক্তি(রই বিরাগ ভাজন হতে চায়নি। সকলকেই সে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিল। আর্থিক নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় অর্থনীতি অনেক (ে ত্রেই বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতের আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রচুর মার্কিন ডলার এসেছিল। আবার ১৯৫০-এর দশকে কিছু কিছু ভারী শিল্প গড়ে তোলার (ে ত্রে ভারত সোভিয়েতের সহযোগীতা পেয়েছিল।

আবার অনেকে জোটনিরপে(নীতির অস্তিত্ব নিয়ে প্র্ন তুলেছেন। তাঁরা দাবি করেছেন যে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় বা ১৯৬৫ সালে ভারত পাক যুদ্ধে ভারত জোট নিরপে(নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে শক্তি(সাম্য নীতির ওপর অনেক বেশী নির্ভর করেছিল।

জোট নিরপে(নীতি কার্যকর করার (ে ত্রে নেহে(সরকার গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৪৯-৫০ সাল নাগাদ আমেরিকা যুক্ত(রাষ্ট্রের হস্ত(েপের বি(দ্ধে উত্তর কোরিয়া যখন সংগ্রাম চালিয়েছিল, তখন ভারত কোরিয়ার সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল এবং কোরিয়ার সংকটের জন্য সরাসরি মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রকে দায়ী করেছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পূর্ণ মদতে ইস্রায়েল মিশরের বি(দ্ধে অন্যায় যুদ্ধ শু(করে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইস্রায়েলকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করে এবং ইস্রায়েলের মিশর আত্র(মণ রাষ্ট্রসংঘের সনদের পরিপন্থী বলে অভিযোগ করে। কিন্তু একই বছর হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত বাহিনী হাঙ্গেরীতে অনুপ্রবেশ করে। তখন কিন্তু ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার বি(দ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নেয়নি। সমাজতন্ত্র বাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ অভিযোগ করেছিলেন মিশর ও হাঙ্গেরীর (ে ত্রে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তর দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেছে।

১৯৫০-র দশকে জোট নিরপে(নীতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের (ে ত্রেই কেবল গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি, দুই বৃহৎ শক্তি(র প্রভাবমুক্ত(দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার (ে ত্রেও জোটনিরপে(নীতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই ১৯৪৭-এর মার্চে ভারত দিল্লীতে এশীয় দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সংত্র(ান্ত একটি সম্মেলন (Asian Relations conference) আহ্বান করে। এই আলোচনা বেসরকারী স্তরে হলেও অনেকে মনে করেন এই সম্মেলন ছিল জোট নিরপে(আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি(সংগ্রামকে সমর্থন জানানো হয়েছিল। জাতিগত বৈষম্যের বিরোধীতা করা হয়েছিল এবং ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পরিবর্তে স্বাধীন আর্থনীতিক বিকাশের কথা বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় এশিয়ান রিলেশনস্ কনফারেন্সের আহ্বায়ক ছিল নেহে(। ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে এই সম্মেলন বসে। বিভিন্ন এশীয় দেশ ছাড়াও এই সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা

মহাদেশের ইথিও পিয়া ও মিশর এই সম্মেলনে যোগ দেয়। ফলে এই সম্মেলন কেবল এশিয় দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

১৯৫০-এর দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহ(শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংত্র(ান্ত পাঁচটি নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতিগুলি 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। নীতিগুলি ছিল—বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অপরদেশকে আত্র(মণ না করা, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্ত(প না করা, সাম্য ও পারস্পরিক সহযোগীতা নীতি মেনে চলা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ভারতে আসেন। 'পাঞ্চশীল নীতি' গ্রহণের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর যুগো(াভিয়ার রাষ্ট্রপতি টিটো ভারতে আসেন। নেহে(ও টিটো একটি যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে জোট নিরপে(নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন।

১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে কলম্বো শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনকে 'জোট নিরপে(' আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা বলা যায়। এই সম্মেলনেই সর্বপ্রথম জোট নিরপে((Non-alignment) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কলম্বোতে যোগদানকারী শক্তি(গুলি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে মিলিত হয়। বান্দুং সম্মেলন জোট নিরপে(আন্দোলনের (ে ত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদ(েপ হিসাবে স্বীকৃত। বান্দুং সম্মেলন ছিল বিভিন্ন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির দুই বৃহৎ শক্তি(র প্রভাবমুক্ত(স্বাধীন সত্তা ঘোষণার সর্বপ্রথম যৌথ প্রয়াস। এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশের প্রতিনিধিরা বান্দুং সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। বান্দুং সম্মেলনে কতগুলি নীতি গৃহীত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে গু(ত্বপূর্ণ ছিল মৌলিক মানবাধিকার র(া, রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা, সকল বর্ণ ও জাতির সমান অধিকার, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্ত(েপ না করা এবং শান্তিপ্রয়োগ না করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা ইত্যাদি। তাছাড়া এই সম্মেলনের প্রতিনিধিরা দ(িণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের বি(দ্ধে এবং প্যালেস্টাইনের আরবদের অধিকার র(ার দাবিতে সরব হয়েছিলেন।

জোট নিরপে(আন্দোলনকে সফল করার (ে ত্রে নেহে(মিশরে রাষ্ট্রপতি নাসের, ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সুকর্ণ, ঘানার নত্র(মা এবং সুযো(াভিয়ার টিটোর কাছ থেকে মূল্যবান সহযোগীতা পেয়েছিলেন। এই নেতাদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালের ৫ জুন থেকে ১২ জুন কাইরোতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়রো সম্মেলনে জোটনিরপে(তা, বি(েশান্তি র(া, জাতীয় মুক্তি(আন্দোলন ইত্যাদি আদর্শের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছিল। কায়রো সম্মেলনের কিছুদিন পর ১৯৬১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুগো(াভিয়ার বেলগ্রেড জোটনিরপে(দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন বেলগ্রেড সম্মেলন ছিল জোটনিরপে(আন্দোলনের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। জোটনিরপে(আন্দোলন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল সন্দেহ নেই।

৪.২ ভারত এবং বৃহৎ শক্তি(বর্গ

দ্বিতীয় বি(ে যুদ্ধোত্তর পর্বে যখন মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত((তখন ভারতবর্ষ জোট নিরপে(আন্দোলনের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের জোট নিরপে(তা বস্তুত সোভিয়েত এবং মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র কোন পথ চিহ্নি(ত করতে পেরেছিল কিনা

অথবা এই দুই বৃহৎ শক্তি(র যে কোন একটি প্রয়োজন মিটিয়ে ছিল কিনা তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে(ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বি(ের দেশগুলির মধ্যে সমাজবাদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা সূত্রে আনার এও ঠিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সময় এত দেশের শাসকবর্গের চিন্তা ভাবনার পশ্চাতে পাশ্চাত্য উদারনীতি বাদের প্রভাবও কম ছিল না।

অন্যান্য যে কোন দেশের মতো ভারতের বিদেশনীতি ও প্রভাবিত হয়েছে বাস্তব পরিস্থিতির দ্বারা ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান দ্বিতীয় বি(যুদ্ধের পরেই মার্কিন শিবিরে যোগ দিয়েছিল। কা(্মীর সমস্যা কেন্দ্র করে পাক ভারত সম্পর্কের জটিলতা দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হয়েছে, অপরদিকে ভারতের প(ভোলা সম্ভব নয় ভারত মহাসাগর অঞ্চল এবং বস্তুত পৃথিবীর জলভাগের উপর পাশ্চাত্য শক্তি(বর্গ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। ভৌগলিক কারণ বশত J. C. Kunelre বলেন ভারতবর্ষ কমিউনিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অক্টোবর বি(প-বের পর সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ উপনিবেশিক শাসনটি জনগণের জাতীয় মুক্তি(আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দলকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগঠন জ্ঞান করত সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন সোভিয়েতের অনুমোদন লাভ করত বলে ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শু(তে সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করতে পারেনি, পরে কা(্মীর প্র(্নে মার্কিনের মিত্র পাকিস্তানের বি(দ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের প(সোভিয়েত ইউনিয়নের ভোটদান ভারত সোভিয়েত বন্ধুত্বের বুনিয়াদ রচনা করে, অন্য দিকে পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডাসেস ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৪৯-এর অক্টোবর এ গণ প্রজাতন্ত্রী চীনে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হবার পর অসমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে ভারতই প্রথম ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতের এই মনোভাব মার্কিন প্রশাসনের মনঃপুত হয়নি।

পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার অধিবাসী গণ ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি(কামনা করে আন্দোলন শু(করলে ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মনোভাবের পার্থক্য দেখা দেয়। ১৯৫৫ সালে সোঃ ইউঃ গোয়াকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পর্তুগাল ও মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র এতে (ষ্ট হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস মনে করতেন গোয়া পর্তুগালের (মতাধীন, ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর শু(তে ভারত যখন গোয়া অধিকার করে তা নিয়ে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র হৈচৈ করে। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া দখল দিতে ভারতের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকার সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্রসহ অনেক পশ্চিমী শক্তি(ভারতের বিরোধীতা করে, কিন্তু জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর সমর্থন লাভ করেছিল ভারত।

১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত বিরোধের সময় ভারতের প্রতি সহযোগিতা সহানুভূতির মাধ্যমে মার্কিন প্রশাসন শুভেচ্ছা অর্জনের চেষ্টা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহে(র সাহায্যের আবেদনে সারা দিয়ে মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র কেনেডি এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান একটি বৈঠকে মিলিত হন। মার্কিনের কাছ থেকে ভারত অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। একই সময় আশা ভারতের প্রতির(া ব্যবস্থাকে শক্তি(শালী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতে মিগ বিমান তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য চুক্তি(করেছিল। প্রধানত মার্কিন উদ্যোগে কা(্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু কোন গ্রহণযোগ্য সমাধান সূত্র নির্দ্ধারণ করা যায়নি।

১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান হঠাৎ কা(্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিত্র(ম করে ভারতের উপর আত্র(মণ শু(করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আমুর খানের অনুরোধ সত্ত্বেও মার্কিন সরকার কোন হস্তপে(করেনি। চীন যাতে ঐ

যুদ্ধে হস্ত(েপ না করে সে সম্পর্কে অবশ্য ব্রিটিশ সরকার হুশিয়ারী দেয়। সোভিয়েত পরিস্কার বক্ত(ব্য পেশ করেছে। মার্কিন যুক্ত(রাষ্ট্র উভয় দেশকেই সাময়িকভাবে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দান বন্ধ করে। এই সময় ভারত পাক বিরোধ মীমাংসায় সোঃ ইউঃ ও গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে ৩-১০ তাসখণ্ড শহরে ভারত প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানর রাষ্ট্রপতি আমুর খাঁ আলাপ আলোচনার পর দুইদেশের বিরোধের মীমাংসা করে সম্পর্ক স্বাভাবিকের জন্য চুক্তি(বদ্ধ হয়েছিলেন।

৪.৩ ভারত-চীন সম্পর্ক

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার বিকাশ যেসব দেশে ঘটেছিল ভারত চীন তার মধ্যে অন্যতম। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। চীন ভারতীয় পণ্যসামগ্রী সমাদর লাভ করত। বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে চীনে বিস্তার লাভ করেছিল। ফা হিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে চীন থেকে ভারতে আসেন। বিংশ শতকে চীনের বি(দ্ধে জাপানী আগ্রাসনের সমালোচনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সরব হয়েছেন। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারত প্রথম তাকে স্বীকৃতি জানায় (৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৯)। পশ্চিমী শক্তি(গুলির বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের সদস্যপদ লাভের জন্য ভারত প্রচার চালিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী সো-এন-লাই-এর ভারত সফর কেন্দ্র করে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধে ভারত চীনকে সমর্থন করেছিল। ১৯৫৪ সালে ভারত এবং চীনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়। পঞ্চশীল বা পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে ঃ

(১) একে অন্যের ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা জ্ঞাপন করবে।

(২) একে অন্যের অভ্যন্তরীণ (ে(ত্রে হস্ত(েপ করবে না।

(৩) পরস্পরের বি(দ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে।

(৪) পরস্পরকে মর্যাদা এবং সুবিধা দান করবে।

(৫) শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের নীতি অবলম্বন করবে।

তিব্বতে চীনের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ভারত-চীন সম্পর্কে ফাটল ধরে। ১৯৫০ সালে দালাইলামা এবং পাঞ্চেতলামার সঙ্গে যুক্তি(করে চীন তিব্বতের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ভারত এবং চীনের মধ্যে এর ফলে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। চীনা সৈন্য ভারতীয় সীমান্ত অতিত্র(ম করে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে সৌধ এন লাই ভারত সফরে আসেন। পূর্বদিকে ম্যাকমোহন লাইনকে চীন ভারতের সঙ্গে সীমান্তরেখা হিসাবে স্বীকার করলেও উত্তরে সীমান্ত রেখা তিব্বতের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হবে বলে তিনি জানান।

১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আকসাই চীন অঞ্চলে প্রহরারত ভারতীয় সেনাদের চীন গ্রেপ্তার করে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতে চীন বিরোধী বিদ্রোহ শু(হয়। দালাইলামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। লাদাখের এক বিরাট অংশ চীন অধিকার করেছে বলে ভারত অভিযোগ করে। চীনের মানচিত্রে ভারতের এক বিরাট অংশ চীনের অন্তর্ভুক্ত(বলে দেখানো হয়েছে(সেখানে চীন রাস্তাঘাট এবং বিমান অবতরণ (ে(ত্র নির্মাণ করেছে— এই মর্মেও ভারত আপত্তি জানায়।

১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর লাদাখ ও নেফা অঞ্চলে চীন-ভারত যুদ্ধ শু(হয়। ভারত এই যুদ্ধের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। চীনা সৈন্য ভারতের অভ্যন্তরে দ্রুত গতিতে প্রবেশ করে। ২১শে নভেম্বর চীন একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। পাক-অধিকৃত কা(্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তান চীনের হাতে তুলে দেয়। বিনিময়ে পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে চুক্তি(স্বা(রিত হয়। ১৯৬০-এর দশকের শু(তে চীন-সোভিয়েট বিরোধ ঘনীভূত হলে ভারতকে সোভিয়েট আরও সাহায্য করে। চীন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ইদানীং দুই দেশের প(থেকেই আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। চীন-ভারত বাণিজ্যের জন্য নাথুলা গিরিপথ খুলে দেওয়া হয়েছে।

৪.৪ পাক-ভারত সম্পর্ক

ভারতের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের বিরোধিতা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম ল(ণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই বিরোধের প্রধান কারণ চারটি ঃ (১) উদ্বাস্তু সমস্যা, (২) কা(্মীর সমস্যা, (৩) জল-সংত্র(ান্ত বিরোধ এবং (৪) পাকিস্তানের পশ্চিমী শক্তি(জোটে যোগদান। প্রথম দুটি সমস্যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। (দ্রষ্টব্য, একক ১.২ এবং ১.৩)

সিন্ধু নদের জল বণ্টন সমস্যা নিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের বিরোধের ইতিহাস দীর্ঘ। সিন্ধু নদের যেসব শাখা পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার সব কটির উৎস ভারতে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি(র মাধ্যমে স্থির হয়, সিন্ধুনদের জল ভারতের অধিকারভুক্ত(হলেও, জলসমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানকে সময় দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সমস্যা সমাধান কিন্তু পাকিস্তানের প(সম্ভব হয়নি। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের সময়ে পাকিস্তান আশঙ্কা প্রকাশ করে এর ফলে তার অংশে সিন্ধুনদের জল কম প্রবাহিত হবে। শেষ পর্যন্ত বি(্ব ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ১৯৬০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহে(পাক-প্রধান আইয়ুব খাঁ-র সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি(স্বা(র করেন। পরবর্তী দশ বছরের জন্য ভারত পাকিস্তানকে চেনাব, ঝিলাম এবং সিন্ধু নদের জল ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তানকে জল সমস্যা সমাধানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে বলা হয়। এজন্য অন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারত পাকিস্তানকে সাহায্য করতে রাজি ছিল। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের সময়েও পাকিস্তান আপত্তি প্রকাশ করেছিল। পাকিস্তানের এই প্রসঙ্গে কিছু দাবি ভারত মেনে নিয়েছে।

ভারত নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও পাকিস্তান শু(থেকে পাশ্চাত্য শক্তি(জোটের সঙ্গী হয়েছে। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে পারস্পরিক প্রতির(া চুক্তি(তে আবদ্ধ হয়। মার্কিন নেতৃত্বাধীন দ(ণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তি(জোট (SEATO) এবং বাগদাদ চুক্তি(তেও (CENTO) পাকিস্তান স্বা(র করে। জাতিপুঞ্জে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সমর্থন পাকিস্তানের প(থাকায় কা(্মীর সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বার্থ-বিরোধী প্রতিটি প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে। ভারত-চীন যুদ্ধের পর পাকিস্তান চীনের সাহায্য লাভের জন্যও তৎপর হয় এবং ''আজাদ কা(্মীর''-এর একটি অংশ চীনকে সমর্থন করে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যে বেসরকারি বিমান চলাচল সম্পর্কে একটি চুক্তি(স্বা(রিত হয়। পাকিস্তান চীনের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে। জাতিপুঞ্জে কা(্মীর প্রসঙ্গে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত আত্র(মণ করে। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় হয়। তাসখণ্ডে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আইয়ুব খানের চুক্তি(স্বা(রের মধ্য দিয়ে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (জানুয়ারি ১৯৬৬)।

৪.৫ ভারত এবং দ(িণ ও দ(িণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি

দ(িণ এবং দ(িণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ভারত শু(থেকেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ নির্জোট আন্দোলনে নেহে(র পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বর্মার (বর্তমানে মায়ানমার) প্রধানমন্ত্রী উ লু ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সমর্থন করেন। ভারতের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতিতে তাঁর কিছুটা অবদান ঢাকতে পারে বলে মনে করা হয়। নেপালের নিরাপত্তা র(ার প্রতিশ্রুতি ভারত দেয়। ইন্দো-চীনে সাম্রাজ্যবাদের বি(দ্ধে ভারত মত প্রকাশ করে। সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) রাষ্ট্রে বহু সংখ্যক তামিল অধিবাসীদের বসবাস ভারতের সঙ্গে তখন পর্যন্ত সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়নি। বরং প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী দেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন।

৪.৬ অনুশীলনী

(১) ১৯৪৭-এ নব প্রতিষ্ঠিত ভারত রাষ্ট্রের সমস্যাগুলির স্বরূপ সম্পর্কে কি জানেন?

(২) ভারত রাষ্ট্রের উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে কি জানেন?

(৩) স্বাধীন ভারত দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি(করণ সম্পর্কে কি জানেন?

(৪) ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের কা(্মীর সমস্যা সম্পর্কে কি জানো?

(৫) ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে কি জানেন?

(৬) নেহে(শাসনাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ কিভাবে হল?

(৭) নেহে(শাসনাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি ভারতে সামাজিক ন্যায় বিচারের আন্দোলন সম্পর্কে কি জানেন?

(৮) জোট নিরপে(আন্দোলন সম্পর্কে কি জানেন?

(৯) ভারত-পাক ও কা(্মীর সমস্যা (১৯৬৪ পর্যন্ত) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা ক(ন।

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Paul R. Brass : The Politics of India Since Independence.
2. Pranab Bardhan : The Political Economy of Development in India.
3. Francine R. Frankel : India's Political Economy 1947–77 : The Gradual Revolution.

4. S. Bose & A. Jalal (edn.) : Nationalism Democracy and Development : State and Politics in Development.
5. Francine R. Frankel, Z. Hasan., R. Bhargava and B. Arora (edn) : Transforming India.
6. Bipan Chandra, Aditya Mukharjee and Mridula Mukherjee : India After Independence.
7. Partha Chatterjee : The Nation and its Fragments.
8. বিপান চন্দ্র, মৃদুলা মুখার্জি, আদিত্য মুখার্জি ঃ ভারতবর্ষ ঃ স্বাধীনতার পর।